মার্ক্সবাদ, বিজ্ঞান ও ধর্ম
(জন্মশতবর্ষে অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্মরণে)
শঙ্কর রায়

কার্ল মার্কসের মৃত্যুশতবর্ষে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি গবেষণা-সন্দর্ভ 'সাম থটস ওন মার্কস অ্যান্ড রিলিজ্যন' (নয়া দিললীতে 'মার্কস, মার্কসিজম অ্যান্ড ইন্ডিয়া' সেমিনারে, ২২-২৪ এপ্রিল, ১৯৮৩-এ পঠিত) বিজ্ঞান ও ধর্মকে মার্কসবাদের দৃষ্টিকোন থেকে বিচারে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। পঁচিশ বছর পরে তার পুর্নপাঠ বর্তমান দুনিয়ার দার্শনিক সংকটে এই প্রতিবেদকের কাছে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। সেজন্য এই সংক্ষিপ্ত রচনাটি হীরেন্দ্রনাথকে নিবেদিত করছি।

মার্কস ধর্ম সম্পর্কে বিশদভাবে লেখেন নি, যদিও অল্প পরিসরে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছিলেন। এই স্বল্পতার জন্যে ধর্ম সম্পর্কে তাঁর ধারণা বিকৃত ও অপব্যাখ্যা করা হয়। তিনি আস্তিকদের কখনো সেই অর্থে বিদ্রূপ বা ব্যঙ্গ করেন নি। তাঁর কন্ট্রিব্যুশ্যন টু দি ক্রিটিক অফ হেগেল'স ফিলজফি অফ রাইট-প্রবন্ধে লিখেছিলেন- 'ধর্ম-নিপীড়িত প্রাণীর দীর্ঘশ্বাস, আত্মাহীন আত্মার মত হৃদয়হীন পৃথিবীর হৃদয়। জনগণের আফিম'[১]। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, ধর্ম মানুষের সৃষ্টি, ধর্ম মানুষ গড়ে নি। ধর্ম মানুষের সচেতনা, আত্ম-উপলব্ধি, কিন্তু এ উপলব্ধি বিশ্বচেতনাকে উল্টো করে দ্যাখে। ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এই উল্টো বা ভ্রান্ত উপলব্ধি নিরসনের জন্যে। তিনি ধর্মের তথা ধর্মগুরুদের আধিপত্যের (কখনো সখনো প্রাক-সামন্তবাদী নিপীড়ন) সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রভাব বা দূষণ নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। জনগণের প্রকৃত সুখীজীবন কায়েম না হলে ধর্মভীরু মানুষের কুসংস্কার বা মায়া (অর্থাৎ ধর্মেই সুখ) থেকে মুক্ত হবেনা[২] ।

প্রচ্ছন্ন পরিহাস তাঁর ঐ প্রবন্ধে ছিলনা, তা মোটেই নয়। 'স্বর্গের সমালোচনা পরিণত হয় পাথিব সমালোচনায়, ধমতত্বের সমালোচনা রাজনীতির সমালোচনায়'। হীরেন্দ্রনাথের মতে মার্কস এ নিয়ে সময় নষ্ট করেন নি, অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন। ডি বি ম্যাক্কাওনের (দি ক্লাসিক্যাল মাকসিস্ট ক্রিটিকস অফ রিলিজ্যন-মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, কাউটসকি- গ্রন্থের রচয়িতা) একই মত। অর্থাং মার্কস ধর্ম সম্পর্কে কোনো বিশদ তত্বায়ন করে যাননি। কিন্তু মার্কসবাদ তো কোনো আপ্ত বাক্য নয়। মার্কস রেখে গেছেন মার্কসীয় তথা হেগেলীয় বিচার পদ্ধতি (হেগেলের সমালোচনা করলেও আজীবন তিনি নিজেকে হেগেলের শিষ্য মনে করতেন), যা আমাদের মার্কসীয় দৃষ্টিতে ধর্ম-বিচারের প্রধান আয়ুধ। সে কারণেই প্রয়োজন হলে 'ক্রিটিক্যাল মার্কসিজম'-এর আশ্রয়ও নিতে কুণ্ঠিত হওয়া যাবেনা[৩]। ডেভিড ক্যট-এর মতে মার্কস ধর্মকে গীর্জার বা ধর্মযাজকদের চোখ দিয়ে দেখার

---

1 কার্ল মার্ক্সের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিটি ছিলো –'Religious distress is at the same time the expression of real distress and the protest against real distress. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, just as it is the spirit of a spiritless situation. It is the opium of the people'.

2 The abolition of religion as the illusory happiness of the people is required for their real happiness. The demand to give up the illusion about its condition is the demand to give up the conditions which needs illusions" (Karl Marx: Contribution to the Critique of Hegel's Philosophy of Right).

3 লেলিন গোর্কিকে লিখেছেন, "On the question of God, the Godlike and everything connected with it, there is a contradiction in your position…it is clearly reactionary and reactionary. Like the Christian socialists (the worst variety of 'socialism', and its worst distortion, you make use of a method which despite your best

বিরোধিতা করেছিলেন। সেজন্যে তিনি ক্রিশ্চিয়ান মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, যেমন ভেনেজুয়েলার বিপ্লবী প্রেসিডেন্ট উগো শ্যাভেজ যিশু খৃষ্টের মানবধর্মের কথা প্রায়শ উল্লেখ করেন।

মার্কস ও এঙ্গেলস ধর্মকে জর্মন দর্শনের সমালোচনার ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেছেন, অনুসরণ করেছেন তাঁদের পূর্বসূরীদের (যথা ডেভিড ফ্রেডরিক স্ট্রস ও ব্রুণো বয়ার)। 'মানুষকে জন্তুদের থেকে পৃথক করা যায় চেতনাবোধ ও ধর্ম দিয়ে, এ কথা মেনে নিয়েও বলেছেন যে তার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে আধিভৌতিক, রাজনৈতিক, বিচারব্যবস্থাগত ও নৈতিক চেতনা - আর এর সবটাই পরিচালনা করে ধর্মগত ও ধর্মতত্বগত ব্যবস্থাপনা (মার্কস -এঙ্গেলস : ফয়েরবাখ: অপজিস্যন অফ দি মেটেরিয়ালিস্ট অ্যান্ড আইডিয়ালিস্ট আউটলুকস , প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো, ১৯৭৬, পৃ ২৩-২৫)। এঙ্গেলস নিজে অন্যভাবে ধর্মের বিকাশ ব্যাখ্যা করেছেন, কেন ধর্মকে মার্কস আফিম বলেছিলেন তার পরোক্ষ ব্যাখ্যা মেলে[৪]।

লেনিনও ধর্ম সম্পর্কে রচনায় কখনো যান্ত্রিকতা বা গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দেননি। কিন্তু তিনি ধর্ম ও ধর্মযাজকদের প্রতিক্রিয়ার বিপজ্জনক সম্ভাবনা সম্পর্কে শ্রমজীবিদের সচেতন থাকতে বলতেন।রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-র খসড়া কর্মসূচির ধর্ম সংক্রান্ত অনুচ্ছেদে নির্দিষ্ট করে বলেছিলেন - 'পার্টির উদ্দেশ্য নিপীড়নকারী শ্রেণীর সঙ্গে সংগঠিত ধর্ম-প্রচারের সংযোগ ছিন্ন করা এবং শ্রমজীবি জনগনকে ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে প্রকৃত মুক্ত করা। তার জন্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও ধর্ম-বিরোধী প্রচার করা। তবু দেখতে হবে যাতে আস্তিকদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত না লাগে, নচেৎ ধর্মান্ধতা বেড়ে যাবে।' (লেনিন-সংগৃহীত রচনাবলী, খন্ড ২৯,পৃ ১৩৪)।

লেনিন ও বলশেভিকদের বিরুদ্ধে তখন চার্চ ও জারের যুগলবন্দী এবং ধর্মের বিরুদ্ধে মতাদর্শগতভাবে অনড় অবস্থান অনিবার্য ছিল, তবু তিনি বুঝতে ভুল করেননি যে সাধারণ ধর্মভীরু মানুষরা নিপীড়িত শ্রেণীভুক্ত। অবশ্য তিনি আস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগতভাবে সংগ্রামের কতর্ব্য থেকে কখনো সরে যাননি। গোর্কিকে লেখা কয়েকটি চিঠিতে তা পরিষফুট । গোর্কি প্রচলিত আস্তিক্যবাদের ব্যাখ্যায় লিখেছিলেন, 'ঈশ্বর উপজাতি ও মানবসমাজ-উদ্ভুত বহু ধারণার জটিল সমন্বয়, যা সামাজিক অনুভূতি জাগায় ও সংগঠিত করে, যার উদ্দেশ্য ব্যক্তি ও সমাজের যোগসূত্র স্থাপন ও জৈবিক ব্যক্তিসত্তাকে বেঁধে ফেলা'। লেনিন এর বিরোধিতা করে বললেন, এটা বগনানভীয় ভাববাদী ধারণা এ সময় ঈশ্বর প্রতিক্রিয়ার যৌক্তিকতা। বন্ধু গোর্কিকে রেয়াৎ না করে বললেন ঐ ধারণা প্রতিক্রিয়াশীল, কারণ ঈশ্বরীয়

---

intention) repeats the hocus-pocus of the priests: you eliminate from the idea of God everything about it that is historical and drawn from real life (filth, prejudices, sacrificed ignorance and degradation, on the one hand, serfdom,monarchy, on the other), and instead of the reality of history and life there is substituted in the idea of God a gentle petty-bourgeois phrase(God= 'ideas which awaken and organize social feelings') – Lenin Coll Works, Vol 35, pp 127-28)

[4] এঙ্গেলস ধর্মের আরেকটি সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে -: "the fantastic refection in man's minds of those external forces which control the daily life, a reflection in which the terrestrial forces assume the form of supernatutal forces. In the beginning of history it was the forces of nature which were the first so reflected and which in course of further evolution underwent the most manifold and varied personifications among the various peoples… But it is long before, side by side with the forces of nature, social forces begin to be active – forces which confront man as equally alien and at first inexplicable, dominating him with the same apparent natural necessity as the forces of nature themselves."

ধারণা মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চায়, 'সামাজিক অনুভূতি'কে ভোঁতা করে, সজীবকে মৃতবৎ করে দাসত্বের দিকে ঠেলে দেয়।

কিন্তু লেনিন ধর্ম-প্রসঙ্গে শ্রমিকশ্রেণির দৃষ্টিকোন কি হওয়া উচিত, সে নিয়ে আত্যন্তিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। মার্কসবাদ যেহেতু বস্তুবাদ-ভিত্তিক, তিনি বলেছিলেন, ধর্মের প্রশ্নে শ্রমিকশ্রেণিকে নিরন্তর শুধু বিরোধিতা করলেই হবেনা,শত্রুবৎ আচরণ করতে হবে(সং রচ, খন্ড ১৫ পৃ ৪০৩-৪)। তিনি এরফুর্ট কর্মসুচির (১৮৯১) কথা (সোশ্যাল ডেমক্র্যাসীর রাজনৈতিক কৌশল প্রসঙ্গে) বলেছিলেন, কিন্তু সেখানে বলা হয়েছিল ,'রিলিজ্যন ইজ আ প্রাইভেট ম্যাটার', ধর্মাচরণের আদ্যন্ত বৈর, তা বলা হয়নি। ঐ লেখায় (বক্তৃতা) লেনিন নিজেই তা উদ্ধত করেছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ উচ্চশ্রেণী-নিয়ন্ত্রিত ধর্ম-ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করে বলেছিলেন, 'পুরোহিত-তন্ত্র স্বভাবতই নিষ্ঠুর ও নিষ্করুণ', যার জন্য হিন্দু সমাজের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। সেজন্যে তিনি লিখেছিলেন, 'ব্রামহনজাতির কতর্ব্য - ভারতের অন্যান্য জাতির উদ্ধারের চেষ্টা করা।---- তিনি যদি শুধু টাকার চেষ্টায় ঘরিয়া বেড়ান, তাঁহাকে যথার্থ ব্রামহন বলা যায়না' (পুরোহিত ও অধিকার)। বণবিভাগের বিরোধিতা করে বলেছিলেন, 'উহা জাতির উন্নতির প্রতিবন্ধক' (বৈসাদৃশ্য দূর কর)। তথাচ বিবেকানন্দ ব্রামহন্য আধিপত্যের পক্ষে ছিলেন। মনু সংহিতা উৎকলিত করে (ব্রামহমো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।/ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে) যুক্তি খাড়া করলেন যে তাঁদের কাছে আছে 'ধর্মের ভান্ডার'। স্বামীজি তো ধর্মবিরোধী (বিশেষত হিন্দু ধর্ম) ছিলেননা, এবং ব্রামহন্য আধিপত্যের পক্ষেও, তা না হলে তিনি যে প্রশ্ন প্রকাশ্যে রাখতেন, তা হল যে অন্যান্য বর্ণের মানুষেরা ঐ ভান্ডার-বন্চিত হল কেন?

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সমপাদক অর্ধেন্দু ভূষণ বর্ধন ১৯৯১ সালে (তখন তিনি সাধারণ সমপাদক হননি) পার্টির অধুনা-লুপ্ত মাসিক পত্রিকা 'পার্টি লাইফ' এ একটি প্রবন্ধে - মাকর্সজিম,রিলিজ্যন ,হিন্দুত্ব -ভারতীয় উপমহাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে মৌলিক দৃষ্টিতে ধর্মের বিতর্ক তুলে ধরেন। বৌদ্ধধর্ম ও স্যাখ্য দর্শনে যে যুক্তিবাদ ও নাস্তিকতার স্বীকৃতি আছে তা পশ্চিমী পন্ডিতেরা (মার্কসবাদী তাত্বিকরাও) চর্চা করেননি। বর্ধন লেখেন যে, বৌদ্ধধর্ম কোনো ঐশ্বরীয় ডক্ট্রিন, সর্বশক্তিমান বা সর্বপ্রজ্ঞাবান ঈশ্বর প্রভৃতি ধারনার কথা বলেননি। কারণ গৌতম বুদ্ধ আধিভৌতিক কিছু মানতেন না। আমি মনে করি ঐ প্রবন্ধটি ব্যালা, উরদু, হিন্দী, তামিল, মালয়ালি ইত্যাদি ভাষায় অনূদিত ও বহুল-প্রচারিত হওয়া উচিত, ধর্মানধদের (আমি মৌলবাদী শব্দটি এদের প্রতি প্রযোজ্য নয় মনে করি, কারণ ফান্ডামেন্টাল ফান্ডামেন্টালিজম শব্দটি বিজ্ঞানেই প্রয়োগ করা উচিত) এভাবেই বিতর্কে নামতে বাধ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে বলছি যে 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর', এই ধারণার সম্ভবত কোনো শাস্ত্রীয় ভিত্তি নেই । উপনিষদে আছে, 'প্রশ্নেন পরিপ্রশ্নেন'[5]

বর্ধন যথার্থ লিখছিলেন যে, কমিউনিস্টরা ধর্ম থেকে বিরত থাকবে, কিন্তু যখন তা সামাজিক রূপ নেয় - যেমন, দুর্গাপূজা, ঈদ, ক্রিসমাস - সেখানে মিলন-অনুষ্ঠান বা মোলাকাতে তাঁরা অংশ নিতেই পারেন[6]।

---

[5] "Question, Counnter-question"

[6] বর্ধন লিখেছেন, : "Marxists recognize that they must respect the individual's religious belief. We seek no conflict between us and true devotees of all faiths. We respect the right to their beliefs ….
What about Marx's aphorism that ' religion is the opium of the people?' I have indicated that the aphorism torn from its contect is interpreted one-sidedly.

এখানে লেনিনের কথা তিনি অন্ধভাবে না মেনে ঠিকই করেছেন। তাতে তিনি মোটেই অমার্কসবাদী হয়ে জাননি। কারণ মার্কসবাদ কোন পয়গম্বরের আপ্তবাক্য নয়, কর্মের নির্দেশ।

শেষত, বিজ্ঞানীকে কি নাস্তিক হতেই হবে? এ নিয়ে তর্কের মীমাংসা হয়নি। আমাদের ছাত্রজীবনে (সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্র হবার সুবাদে) পেয়েছি ফাদার গোরে বা ফাদার ওয়েরস্ট্র্যাটিনের মত বিজ্ঞানীকে। তাঁদের বিজ্ঞান-মানস কোথাও ধর্মীয় দায়বদ্ধতায় ক্ষুন্ন হয়েছিল কি? নিশ্চয়ই না। তবু এ নিয়ে বিতর্ক চলুক। অবিভক্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কিংবদন্তীপ্রতিম সংগঠক ও সাধারণ সমপাদক (১৯৩৩-৪৮) পূরণচাঁদ যোশী বলতেন সৃজনশীলতা জারিত হয় 'ক্ল্যাশেস অফ আইডিয়াজ' থেকে। এই 'ক্ল্যাশেস অব আইডিয়াজ' এর প্রেক্ষাপট তাই রুদ্ধ করে দেওয়া উচিৎ নয়, আকাংক্ষিত নয় অন্যের মুখ চেপে ধরা। বলপ্রয়োগ কোন প্রগতিশীল সিস্টেম গড়ে তুলার চাবিকাঠি নয়। বল প্রয়োগে চেতনার মুক্তি ঘটে না। আসলে ভুল যুক্তির মানুষেরও তাদের মতামত প্রকাশ করার অধিকার দেওয়া উচিৎ। চিন্তা করার সাহস, প্রশ্ন করার সাহস বিতর্কের মাধ্যমে ভুল যুক্তিকে পরাস্ত করে এগিয়ে যাবার প্রেরণা কিন্তু সুস্থ সাংস্কৃতিক আন্দোলনেরই অংগ। অন্ধ আনুগত্যের মধ্যে দিয়ে, প্রশ্নহীন আনুগত্যের মধ্য দিয়ে কোন সিস্টেমই দীর্ঘদিন জোর করে টিকিয়ে রাখা যায় না, তা যতই 'সাম্যবাদী' কিংবা 'জনকল্যানমুলক' বলে প্রচারিত হোক না কেন, আর আমরা তা পৃথিবীর ইতিহাস বিশ্লেষণ করে জেনেছি। ভাবমূর্তি পূজায় আপ্লুত হয়ে অন্ধ স্তাবকতা নয়, বরং প্রতিটি দুর্নীতি, অন্যায়, অবিচার, বঞ্চনা কিংবা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং সর্বোপরি সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ - সংঘাত আর নির্মাণের মাধ্যমেই সভ্যতা এগিয়ে যাক সুস্থ সংস্কৃতির দিকে।

শঙ্কর রায়, সাংবাদিক এবং রাজনৈতিক ভাস্যকার। মুক্তমনায় নিয়মিত লিখে থাকেন। ইমেইল - sankarray62@rediffmail.com